সামাজিক বিভাজন ও অপতথ্যের দায়

নাসরীন জাহান লিপি

অপতথ্য বা ভুল তথ্য (মিসইনফরমেশন/ ডিসইনফরমেশন) শুধু ভুল ধারণা ছড়ায় না, বর্তমানে বাংলাদেশে এটি সমাজে বিভাজন ও মতপার্থক্য গড়ে তুলছে আগের চেয়েও অনেক বেশি পরিমাণে। মানুষ, গোষ্ঠী, রাজনৈতিক দল, ধর্ম বা সম্প্রদায়ভিত্তিক বিভিন্ন মতবিরোধ, পারস্পরিক আস্থা ও সম্প্রীতি কমে যাওয়ার খবর চারপাশে ছড়িয়ে পড়ে। অপতথ্যের উৎস হিসেবে মোটা দাগে কয়েকটি ক্ষেত্রকে চিহ্নিত করা যায়। ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা বেড়েছে। বেড়েছে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম থেকে খবর সংগ্রহের প্রবণতা। কোনটা তথ্য আর কোনটা অপতথ্য তা যাচাইয়ের দক্ষতা না থাকা ও এ সংক্রান্ত বিভ্রান্তি তো আছেই। একটু বিস্তারিত আলাপ করা যাক।

এশিয়া ফাউন্ডেশনের এক গবেষণাপত্র 'মিসইনফরমেশন অ্যান্ড ডিসইনফরমেশন – ডেভেলপমেন্ট লেটারস' অনুসারে ২০২৩ সালের শুরুতে বাংলাদেশে ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা কম বেশি প্রায় ৩৮.৯ শতাংশ । কিশোর-তরুণদের মাঝে মোবাইল ইন্টারনেট ব্যবহারের হার বেশি, ১৮-২৫ বছর বয়সি যারা অনলাইনে খবর ও তথ্য দ্রুত গ্রহণ করে। একই গবেষণায় জানা গেছে, প্রায় ৭০ শতাংশ ব্যবহারকারী বিভ্রান্ত হয় যে তারা সত্য-মিথ্যা তথ্য পার্থক্য করতে পারছেন না। নেচার এর অনলাইন জার্নালে প্রকাশিত 'কগনিটিভ বিহেভিয়ার ডাটা অ্যানালাইসিস অন দ্যা ইউজ অব সোশ্যাল মিডিয়া ইন গ্লোবাল সাউথ কনটেক্সট ফোকাসিং অন বাংলাদেশ' শীর্ষক গবেষণাপত্রে বলা হয়েছে, যারা সোশ্যাল মিডিয়ায় বেশি সময় কাটায়, তাদের মাঝে ভুল তথ্য দ্রুত শেয়ার করার প্রবণতা বেশি। যে উৎস থেকে তথ্যটি পাওয়া গেছে তার ওপর নির্ভরতা ও বিশ্বাস, দ্রুত শেয়ার করার তাড়া, ব্যক্তিগত সম্পর্ক (যেমন বন্ধুবান্ধব/পরিবার) এসব বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে না হয় অপতথ্য ছড়াল, মূলধারার গণমাধ্যমে কেনো আগের চেয়েও অপতথ্যের প্রকাশ বা প্রচার বেড়েছে? ফ্যাক্ট চেকিং সংস্থা 'রিউমার স্ক্যানার বাংলাদেশ' জানিয়েছে, ২০২৪ সালের প্রথম ছয় মাসে, অর্থাৎ জানুয়ারি থেকে জুন পর্যন্ত সময়ে প্রতিষ্ঠানটি মোট ৭৮টি মিথ্যা তথ্যভিত্তিক সংবাদ প্রকাশের ঘটনা শনাক্ত করেছে। এর মধ্যে ৭৮টি ঘটনার প্রায় ৫২ ভাগ হচ্ছে পুরোপুরি মিথ্যা এবং প্রায় ৪৫-৫০ ভাগ মিসলিডিং বক্তব্য, ছবি বা ভিডিওকে উদ্দেশ্যমূলকভাবে বিশেষ উদ্দেশ্যে পরিবর্তিত করে প্রকাশ ও প্রচার করা হয়েছে। সংবাদ মাধ্যমগুলোর ভুল তথ্য বা অপতথ্যসংবলিত প্রতিবেদন ভালোভাবে যাচাই করার ব্যাপারটি যদি উপেক্ষিত হয়, তবে অনেক পাঠকই শুধু তাদের রাজনৈতিক বা সম্প্রদায়ভিত্তিক বিশ্বাসকে অনুসরণ করে সংবাদ গ্রহণ করতে শুরু করে যা 'ফিলটার বাবলস' ও 'ইকো চেম্বারস 'সৃষ্টি করে।

অপতথ্য জনমতের দৃষ্টিভঙ্গিকে টুইস্ট করছে এবং জনউদ্বেগ তৈরি করছে। এই সামাজিক ব্যাধি ইতোমধ্যে মহামারির রূপ নিতে শুরু করেছে, তা কি আমরা বুঝতে পারছি? তরুণদের নিয়ে ইউনিসেফ এর একটি জরিপে বাংলাদেশে প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ তরুণ বলেছেন যে সামাজিক মিডিয়ায় “অত্যধিক মিথ্যা সংবাদ ও অপতথ্য” এর কারণে তারা অনেক বেশি মানসিক চাপে ভুগছেন। এই জরিপে শতকরা ৭৯ জন তরুণ বলেছেন, সামাজিক মিডিয়ায় নিয়ন্ত্রণ নীতিমালা বা নিয়ম কমিয়ে দেওয়া হলে ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়, শিশু ও নারীর মতো সমাজের ঝুঁকিপূর্ণ অংশটি বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে। ২০১২ সালে রামুতে একটি ফেইক ফেসবুক অ্যাকাউন্ট থেকে ধর্মীয় স্পর্শকাতর একটি ছবি প্রকাশের পরে একটি সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে সহিংসতা শুরু হয়েছিল। পরে প্রমাণ হয় ছবিটি সত্য নয়, তবে ক্ষতি যা হওয়ার হয়ে যায়।

আমাদের সমাজে রাজনৈতিক ও সামাজিক বিভাজনের ধারা কুৎসিত আকার ধারণ করেছে। শিশু অপহরণের গুজবে গণপিটুনিতে নিরীহ গৃহবধূর মৃত্যু সারা দেশকে নাড়িয়ে দিয়েছিল। এরকম ঘটনার সময় কেন কেউ এগিয়ে আসে না, সে চিন্তা আমাদের ব্যথিত করেছে। এশিয়া ফাউন্ডেশন ও ব্রাক ইনস্টিটিউট অব গভার্নেন্স অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট এর এক জরিপে দেখা গেছে, জনগণের একটি বড়ো অংশের মানসিকতা এরকম দলে ভারি গ্রুপ, গোষ্ঠী বা দলের সাথে থাকতে হবে, নইলে টিকে থাকা মুশকিল। এর ফলে রাজনীতিতে ক্ষমতাসীন দল হয়ে ওঠে অপ্রতিরোধ্যভাবে ক্ষমতাশালী। এ ধরনের একপক্ষীয় প্রভাব থাকা সমাজ রাজনীতির জন্য নেতিবাচক বলেছেন অনেকেই। উল্লেখ করার মতো বিষয় হচ্ছে, ২০১৯-এ নেতিবাচক বলা মানুষের সংখ্যা ২০২২-এ এসে উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। বিভাজন সৃষ্টি হয়েছে। এর প্রভাবও চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি আমরা। অথচ এর কারণ যে অপতথ্য, তা নিয়ে ভাবছি না। সজ্ঞানে-অজ্ঞানে অপতথ্যের বিস্তার ঘটাতে কাজ করছি আমরাই। প্রচারিত অপতথ্য শুধু ভুল ধারণার উৎস নয়, এটি রাজনৈতিক, সামাজিক ও সম্প্রদায়ভিত্তিক গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে প্রকটভাবে বিভাজন ইতোমধ্যে তৈরি করে ফেলেছে। কারণ, মানুষ তথ্যের উৎসের ওপর বিশ্বাসের

ভিত্তিতে অন্যদের থেকে আলাদা মনোভাব গড়ে তোলে। তরুণরা আজ সহজেই বিক্ষুব্ধ হয়। তরুণদের মধ্যে যে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে সেটি শুধু তথ্যের ভুলভাবে উপস্থাপন নিয়ে নয়, বরং গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের প্রতি আচরণ সবসময় ন্যায়সংগত হচ্ছে কি না তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে এবং এর উত্তর তারা পাচ্ছে না। এটি বিভাজনকে বাড়িয়ে দেয়। রাজনীতি-সংক্রান্ত কিংবা সাম্প্রদায়িক- যে বিভাজন বেশি হোক, এতে অপতথ্য গুজব সৃষ্টি করে অনেক সময় দ্রুত আগুনে ঘি দেওয়ার মতো কাজ করে। ঘটনাবলি সত্য বা ভুল প্রমাণিত হতে সময় লাগে। কিন্তু প্রাণ ও সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি, সমাজে পারস্পরিক আস্থা কমে যাওয়া ইত্যাদির জন্য সময় লাগে না।

এটি জানতে কিছু গবেষণামূলক কাজ করা খুব জরুরি। জরিপভিত্তিক গবেষণা ও মনিটরিং বাড়ানো দরকার। সময় সময় দেশব্যাপী জরিপ করে জানা উচিত মানুষের তথ্য গ্রহণের অভ্যাস, বিশ্বাস, ভয় ও বিভ্রান্তির উৎস কি। জরিপের তথ্য পরিকল্পিত নীতি গ্রহণে সাহায্য করে। তথ্য যাচাই ও ফ্যাক্ট-চেক সংস্থাগুলোর সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য সরকারের পক্ষ থেকে তাদের কাজকে উৎসাহ দেওয়া ও জনসচেতনতায় তাদের রিপোর্টগুলো প্রচারণা বাড়ানো যেতে পারে। জনগণ বিশেষ করে তরুণ সমাজের মাঝে শিক্ষা ও মিডিয়া সাক্ষরতা উন্নয়নে দরকার টেকসই পরিকল্পনা। শিক্ষার্থীদের, তরুণদের শেখানো উচিত “কোনো খবর কি যাচাই করা হয়েছে?”, “উৎস কি বিশ্বাসযোগ্য?”, “ছবি-ভিডিও পুরাতন কি নতুন?” ইত্যাদি বিষয় যত্নসহকারে দেখা। গবেষণায় পাওয়া গেছে যে যারা শিক্ষাগতভাবে উন্নত, তারা ভুল তথ্য কম শেয়ার করে। সামাজিক মিডিয়া প্ল্যাটফর্মগুলোর উচিত ফেক অ্যাকাউন্ট শনাক্ত করে অকার্যকর বা বাতিল করার ব্যবস্থা নেওয়া, গুজব ছড়িয়ে পড়ার প্যাটার্ন মনিটর করা। রাষ্ট্রীয় নীতিমালায় যেখানে সম্ভব, মানুষের মৌলিক অধিকার রক্ষা করে বিভাজন কমানোর নির্দিষ্ট দায়িত্ব আরোপ করা যেতে পারে, যাতে সহনশীলতা ও সংলাপ উৎসাহিত হয়। বিভিন্ন সম্প্রদায়, রাজনৈতিক মতের মানুষদের মধ্যে খোলামেলা আলোচনার ব্যবস্থা করা উচিত, যেখানে ভুল ধারণার কারণে হওয়া বিভাজন মোকাবিলা করা যায়। মনে রাখতে হবে, দিনশেষে আমরা আমাদেরই মানুষ।

#

লেখক: উপপ্রধান তথ্য অফিসার, তথ্য অধিদফতর

পিআইডি ফিচার